Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XIV, Issue-II, January 2026, Page No. 43-50
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi, Assam, India
Website: http://www.thecho.in
DOI: 10.64031/pratidhwanitheecho.vol.14.issue.02W.047

চর্যাপদ ও মঙ্গলকাব্য থেকে তারাশঙ্করের কথাসাহিত্য প্রসঙ্গ: নিম্নবর্গের জনজীবন

ড. সাগর সরকার, *সহকারী অধ্যাপক, জে.আর.এস. কলেজ , জামালপুর, মুঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়, মুঙ্গের, বিহার, ভারত*

Received: 10.01.2026; Accepted: 26.01.2026; Available online: 31.01.2026
©2026 The Author(s). Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Social class discrimination has long had a significant impact on the lives of the lower classes. The life of the lower classes is understood to include aspects such as society, culture, and livelihood. The lower class consists of those sections of society that are socially and economically backward. Illiteracy, blind faith, and superstitions have hindered their development.

In Bengali literature, from the ancient period (The *Charyapada*) to the modern age, the position of the marginalized and untouchable classes can be observed in various literary works. The *Charyapada*, dating from the tenth to the twelfth centuries, is a realistic document of the social life of that time. Although it was composed by Buddhist practitioners, it vividly portrays the daily life of lower-class people, their poverty and hardships, their rituals and religious practices, as well as their forms of recreation.

An examination of social stratification shows that these lower-class communities—such as the Dom, Chandal, Shabar, washerman, barber, weaver, fisherman, and potter—were kept away from mainstream society. They were neglected and treated as despised untouchables. Medieval literature was largely religion-centered, and the *Mangalkavyas* describe in detail the narratives of the lower classes. These texts mention various marginalized groups such as the Dom, Shabar, Bagdi, Bauri, Kaibarta, etc. The establishment of deities such as Goddess Chandi and Dharma Thakur is associated with lower-class communities like hunters and Doms. In the fiction of Tarashankar Bandopadhyay, many novels and short stories vividly depict the life and livelihood of lower-class and tribal communities, their folk beliefs and culture, daily living practices, conflicts arising from social customs, primal instincts, love and affection, and the harsh realities of poverty and deprivation.

Keyword: Life of the Subaltern, Tarashankar's Fiction, Charyapada , Mangalkavyas, Occupation.

উচ্চবর্গের সঙ্গে নিম্নবর্গের দ্বন্দ্ব, সামাজিক শ্রেণী বৈষম্য অতি প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত ছিল। এই দ্বন্দ্ব এবং শ্রেণী বৈষম্য সামাজিক জনজীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। বহুদিন থেকেই একশ্রেণীর মানুষ শোষণ করেছে আর একশ্রেণীর মানুষ শোষিত হয়েছে। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই সমাজের শ্রেণীবিন্যাস সৃষ্টি হয়েছে। নিম্নবর্গের মানুষ দীর্ঘদিন ধরেই পদদলিত, শোষিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত হয়েছে নানা কারণে। তাদের মধ্যে লক্ষ্য করা গেছে অর্থনৈতিক অভাব, ক্ষমতার অসম বন্টন, সামাজিক নানা সুযোগ সুবিধা থেকে তাদেরকে বঞ্চিত

করে রাখার প্রবণতা যা তাদের জনজীবনকে উচ্চবর্গের থেকে ভিন্ন পথে পরিচালিত করেছে। এর ফলে নিম্নবর্গের জনজীবনকে বিশেষ ভাবে বিপর্যস্ত করে তুলেছে এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি হয়েছে।

নিম্নবর্গের জনজীবন বলতে সমাজ, সংস্কৃতি,জীবিকা প্রভৃতি এর অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করা হয়। নিম্নবর্গ হল সমাজের সেই শ্রেণীর মানুষ যারা সামাজিক এবং অর্থনীতি থেকে পিছিয়ে পড়া। অশিক্ষা, অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার তাদের উন্নয়নের বাঁধা সৃষ্টি করেছে। অতিপ্রাচীন কাল থেকেই সমাজে যে শ্রেণীবিভাজন লক্ষ্য করা গেছে তাতে দেখা গেছে চতুর্থ শ্রেণী হিসেবে নিম্নবর্গের অবস্থান। যা 'শূদ্র' নামে পরিচিত। এই শ্রেণীর কাজই হল অপর তিন শ্রেণীকে সেবা করা তার দাসত্ব স্বীকার করা। তারা যাতে আর্থিক দিক থেকে উন্নত হতে না পারে, শাস্ত্র অধ্যায়ন করে পরিমিত জ্ঞানার্জন থেকে বঞ্চিত হয়, ধর্মাচারণে অংশগ্রহণ করতে না পারে তার জন্য অপর তিন শ্রেণী (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য) যথাযথ নীতি নির্ধারণ গ্রহণ করত। নিম্নবর্গের অবস্থান সামাজিক দিক থেকে সর্বনিম্ন এবং তাদেরকে জীবিকাগতভাবেই চিহ্নিত করা হলো। বাংলা সাহিত্যে প্রাচীনকাল (চর্যাপদ) থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত বিভিন্ন সাহিত্য সৃষ্টিতে অন্ত্যজশ্রেণির অবস্থান লক্ষ্য করা গেছে। বিশেষ করে মধ্যযুগের সাহিত্য মূলত ধর্মকেন্দ্রিক। মঙ্গলকাব্যগুলোতে নিম্নবর্গের আখ্যান বিষদ ভাবেই বর্ণিত হয়েছে। সেখানে প্রান্তিক মানুষ হিসেবে ডোম, শবর, বাগদী, বাউরী , কৈবর্ত, ব্যাধ তাতি, কামার, কুমোর, কর্মকার, সূত্রধর তেলী, কাঁসারি, ধোবা, কুম্ভকার, মালী, নাপিত, গোপ, পাটনি, চন্ডাল, কিরাত প্রভৃতি নিম্নবর্গের কথা এসেছে। অর্থনীতি সমাজ, সংস্কৃতি, দেশ, জাতি গঠন ও উন্নয়নে এদের প্রত্যক্ষ বা সরাসরি ভুমিকা রয়েছে। কিন্তু সব রকম সুযোগ-সুবিধা অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত আর এ বঞ্চনার পিছনে রয়েছে তথাকথিত উচ্চবর্গ। এই সমস্ত কায়িক শ্রমজীবী মানুষের জীবন সংগ্রামের গাথা যুগ যুগ ধরে লিপিবদ্ধ হয়েছে বিভিন্ন সাহিত্যে। তাদের রয়েছে নিজস্ব ধর্ম, সংস্কার-সংস্কৃতি-লোকবিশ্বাস। তাদের দৈনন্দিন জীবনের কার্যকলাপ, তারা কিভাবে কোন পেশায় নিযুক্ত থেকে জীবিকা নির্বাহ করে, ভাষা, পোশাক, খাদ্য অভ্যাস, শিল্পকলা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, তাদের মধ্যে প্রচলিত আইন কানুন, প্রভৃতি এ সবই তাদের জনজীবনের প্রধান উপাদান হিসেবে গৃহীত। তাদের পেশা মূলত শ্রম ভিত্তিক দিনমজুর। ভাষা মূলত দেহাতী গ্রাম্য, ব্যাকরণ নিয়ম বহির্ভূত। তাতে বিভিন্ন অঞ্চলের কথ্যভাষা এবং তাতে দৈনন্দিন জীবন, পেশা ও অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটে। যা সস্তা এবং সহজে পাওয়া যায় সে ধরনের অপুষ্টিকর খাদ্য তারা গ্রহণ করে। তাদের লোকসংস্কার, লোকসংস্কৃতির মধ্যে উল্লেখ থাকে কঠোর জীবন সংগ্রামের কথা যা তাদের অস্তিত্ব এবং ঐতিহ্যকে ধরে রাখে। যা বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন নামে পরিচিত যেমন মালদায় গম্ভীরা, বীরভূমে ছৌ নিত্য । এছাড়াও টুসু পরব, করমপূজো, বাউল, ঝুমুর, গাজন এসবই নিম্নবর্গীয় জনজীবনের লোকসংস্কার লোকসংস্কৃতির ঐতিহ্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

নিম্নবর্গীয় জনজীবন যদি 'মনুসংহিতা'-র দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করা যায় তাহলে দেখা যাবে সেখানে নিম্নবর্গীয়দের সামাজিক অবস্থান, তাদের বিধি-বিধান, জীবন যাপন প্রণালী, জীবিকা , খাদ্যাভাস, আইন কানুন, ধর্মীয় আচরণ অনুষ্ঠান, ইত্যাদি ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো। গ্রন্থটিতে শূদ্রত্ব প্রাপ্তি এবং শূদ্রসহ অন্যান্য নিম্নবর্গীয় জনজাতির মানুষের বিভিন্ন বিধি-বিধান আলোচনা করা হয়েছে। স্বধর্ম থেকে বিচ্যুত এবং শুদ্রতুল্য হীনজাতিকে বিবাহ করার অপরাধে ব্রাহ্মণকেও শূদ্র রূপে বিবেচনা করা হতো। তিন শ্রেণীর সেবা করাই (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য) তার প্রধান বৃত্তি। অর্থাৎ দাসবৃত্তি তাদের প্রধান বৃত্তি। তারা অতিরিক্ত ধন-সম্পত্তি সঞ্চয় করতে পারবেন না। উচ্চ বর্গীয় ব্রাহ্মণ জাতি যেখানে বসবাস করবেন সেখানে তাদের প্রবেশ অধিকার এবং বসবাসের অধিকার থাকবে না। নিম্ন বর্গীয়দের জন্য বিচার ব্যবস্থাও উচ্চবর্গ ব্রাহ্মণ্য তন্ত্র দ্বারা পরিচালিত হতো। লঘুদন্ডে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেওয়া হতো। কিন্তু এই আইন ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও বৈষম্য লক্ষ্য করা গেছে। ইচ্ছুক অনিচ্ছুক ব্রাহ্মণ নারীর সঙ্গে যদি শূদ্র বা তথাকথিত নিম্নবর্গীয় কেউ যৌনসঙ্গম বা বিবাহ করতেন তাহলে সেই ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হতো। অপরপক্ষে যদি কোন ব্রাহ্মণ পুরুষ কোন শূদ্রতুল্য কোন

নারীর সঙ্গে যৌনসঙ্গমে লিপ্ত হতেন তাহলে তাকে সামান্যতম অপরাধ বলেই গণ্য করা হতো। বিচারের সাক্ষী হিসেবে শূদ্রকে তার স্ত্রী ও সন্তান সন্ততিদের মাথায় হাত রেখে সাক্ষ্য প্রদান করতে হতো এবং স্বীকার করতে হতো যে মিথ্যা বললে সমস্ত পাপের অংশীদার সে হবে। ব্রাহ্মণ হত্যা করলে অবশ্যম্ভাবী তার মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার বিধান ছিল। গ্রন্থটিতে শূদ্রদের সঙ্গে সঙ্গে চন্ডাল, মলেচ্ছ জাতির উল্লেখ করা হয়েছে।

সমাজের পরিষেবা মূলক বিভিন্ন কাজের এ সমস্ত অন্ত্যজ নিম্নবর্গীয় জনজাতিকে নিযুক্ত করা হতো। রাজার ও অন্যান্যদের গুণকীর্তন করার কাজে নিযুক্ত থাকতেন সংবাহক ব্যাধ বা মৈত্রক। খেয়া পারাপার কাজে যুক্ত ছিলেন মার্গবরা। রাজার আদেশে নরহত্যার জন্য নিযুক্ত হতেন সোপাক, বাদ্যযন্ত্র বাজানোর জন্য নিযুক্ত হতেন বিনরা, এরা প্রত্যেকেই সমাজের নিকৃষ্ট হিসেবে বিবেচিত হতেন এবং এদের বসবাসের অধিকার ছিল সমাজের ত্রি সীমানার বাইরে। তাদের চিহ্নিত করা হতো হাতে লোহার বালার দেখে। তাদের বসন ছিল শব দেহ থেকে সংগ্রহ করা বস্ত্র। সম্পত্তি বলতে কুকুর এবং গাধা।

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন-মধ্যযুগের নিম্নবর্গের জনজীবনের সঙ্গে বর্তমান জনজীবনের কিছুটা হলেও পার্থক্য লক্ষ্য করা গেল। তার মূল কারণ অবশ্য আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট। চর্যাপদে যে নিম্নবর্গের জনজীবন দেখতে পাই তা বাস্তবসম্মত। চর্যাপদ মূলত দশম-দ্বাদশ শতাব্দীর জনজীবনের একটি বাস্তব দলিল। এটি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী সাধকদের দ্বারা রচিত হলেও তৎকালীন সমাজের নিম্নবর্গের মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাপন প্রণালী, তাদের দারিদ্র্য অভাব অনটনের কথা, তাদের বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান ধর্মীয় দিক, আমোদ-প্রমোদ অত্যন্ত বাস্তবতার সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। সামাজিক শ্রেনীবিন্যাস বিচার করে দেখা যায় এই সমস্ত নিম্নবর্গীয় মানুষকে (ডোম, চন্ডাল, শবর, ধোপা, নাপিত, তাঁতি, জেলে কুমার) সমাজ থেকে দূরে সরে রাখা হতো। তারা ছিল অবহেলিত, ঘৃণিত অন্ত্যজশ্রেণি। তার দৃষ্টান্ত 'চর্যাপদ'- এ ১০নং পদে রয়েছে- "নগর বাহিরি ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ"।[১]

এছাড়া

২৮ নং পদ রয়েছে- "উঁচা উঁচা পাবত তঁহিঁ বসই সবরী বালী।"[২]

৩৩ নং পদ রয়েছে- "টালত মোর ঘর নাহি পড়বেশী।"[৩]

এদের জীবিকা সম্পর্কেও চর্যাপদের উল্লেখ রয়েছে। তারা তাঁত বোনা, চাঙ্গারি তৈরি করা,পশু শিকার করা, নৌকা বাওয়া, মাছ ধরা, মদ তৈরি এবং তা বিক্রি করা, জঙ্গলে গাছ কাটা, প্রভৃতি কাজের সঙ্গে যুক্ত থেকে জীবন জীবিকা নির্বাহ করত। চর্যাপদ উল্লেখ রয়েছে তারা আহার্য বস্তু হিসেবে দুধ, মাছ, মাংস ব্যবহার করত। তৎকালীন একান্নবর্তী পরিবার ছিল। সামাজিক অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার প্রচলন ছিল। বিবাহে যৌতুক প্রথার প্রচলন ছিল। বিভিন্ন সামাজিক আচা অনুষ্ঠান পালন করার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ বিনোদনের জন্য নাচ গান অভিনয়ের প্রচলন ছিল।

"নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী
বৌদ্ধ নাটক বিষমা হোই।"[৪]

দেবী মনসা, চন্ডীর মতো মঙ্গলকাবের বিভিন্ন দেবদেবীগণ মূলত অনার্য, ও ব্রাহ্মণ্য অন্ত্যজশ্রেণী জনগোষ্ঠীর দেবী হিসাবেই পরিগণিত হতেন। তুর্কি আক্রমণ সামাজিক বিবর্তনের ধারাটি বহন করে আনে। এখানে দেখা গেল উচ্চ ব্রাহ্মণ্য সমাজ নিতান্ত প্রয়োজনের তাগিদে নিম্নবর্গীয় সমাজকে কাছে টেনে নেওয়ার প্রয়াস লক্ষ্য করা গেল। অস্পৃশ্য অনার্য জাতি তথাকথিত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম থেকে এরা দূরেই ছিল। না ছিল তাদের পূজা অর্চনা ও আচার অনুষ্ঠান পালন করার অধিকার, না ছিল কোন ধর্মাচরণ করার অধিকার। এ প্রসঙ্গে অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায় বলেছেন

> "বিশেষত: সমাজের নিম্নস্তরে এবং স্ত্রী-সমাজে, যেখানে আর্য প্রভাব পৌঁছতে অনেক বিলম্ব হয়েছিল, সেখানে তথাকথিত অনার্য প্রভাব বিশেষত: দেবদেবীদের প্রভাব অনেক দিন প্রচ্ছন্নভাবে বর্তমান ছিল। এখনও বাংলার পল্লীতে নানা গাছ-তলায় যে সমস্ত দেবদেবী মহিলাসমাজ কর্তৃক পাজিত হন, তাঁদের কেউ-ই সংস্কৃত মন্ত্রের দ্বারা পরিশদ্ধ নন। পুরাণ গ্রন্থে তাঁদের ঠাঁই মেলেনি। চণ্ডী, মনসা, বাশুলী, ধর্ম, পঞ্চানন প্রভৃতি লৌকিক অর্থাৎ গ্রামের দেবদেবী বাঙালীর আর্যেতর সংস্কার বহন করছেন।" [৫]

উচ্চবর্গীয় মানুষের তথা ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির বাইরে যেসব দেব-দেবীগণ রয়েছেন তাদেরই নিম্নবর্গীয় মানুষ ভক্তিভরে আরাধনা করে থাকে। যা মূলত মঙ্গলকাব্যগুলোতেই লক্ষ্য করা গেছে। সেখানে স্পষ্টত লক্ষণীয় দেবী মনসার আবির্ভাব উদ্ভবের কাহিনী। মনসা দেবীর মর্ত্যে পূজা প্রচারের জন্য চাঁদ সওদাগরের সঙ্গে সংগ্রাম। দেবীর মর্ত্যে প্রতিষ্ঠার পেছনে অবশ্যই অবদান রয়েছে জেলে জালু-মালুর, রাখাল জনগোষ্ঠীর মত নিম্নবর্গীয় মানুষ। অনুরূপ দেবীচণ্ডী, ও ধর্মঠাকুরের প্রতিষ্ঠার পেছনে রয়েছে ব্যাধ এবং ডোমদের মতো নিম্নবর্গীয় জনগোষ্ঠী। তাই প্রয়োজনের তাগিদে মঙ্গল কাব্যের দেব-দেবীগণও নিম্নবর্গীয় জনজাতির সহায়তায় উচ্চবর্গীয় সমাজে পূজা প্রচার করিয়ে নিয়েছেন, আবার সহায় সম্বলহীন নিম্নবর্গীয় জনগোষ্ঠী মঙ্গলকাবের দেব-দেবীগণকে নিজের লৌকিকধর্ম এবং লৌকিকসংস্কৃতি হিসেবে এই সব দেব-দেবীগণকে আপন করে নিয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই তাদের ধর্মচর্যায় অবশ্যই মঙ্গলকাবের এই দেবদেবীগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তাই তাদের ধর্মে স্থানীয় দেবদেবী, গ্রাম্য দেবতা স্থান পেয়েছে। মধ্যযুগের বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে উল্লেখ্য জনজাতির মধ্যে বেশিরভাগই রয়েছে নিম্নবর্গীয় অন্ত্যজ শ্রেণি। তাদের ধর্ম এবং আরাধ্য দেব-দেবী মূলত লৌকিক দেবতা থেকে উদ্ভূত। দেবী মনসা, দেবীচন্ডী ও ধুমঠাকুর তাদের আরাধ্য। এই কাব্যগুলোর পূজক এবং পাঠক সবই নিম্নবর্গ জনগোষ্ঠী।

তুর্কী আক্রমণের পরবর্তী সময়ে নিম্নবর্গীয় জনগোষ্ঠী চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্ম পালন করার অধিকার পায়। এ ছাড়াও লোকায়ত ধর্ম হিসাবে নাথধর্ম, ধর্ম ঠাকুর, সত্য পীর প্রভৃতি দেবতার পূজা অর্চনা করে সমাজে তাদের নিজেদের প্রতিষ্ঠা লাভ করে। নিম্নবর্গের এ সামাজিক প্রতিষ্ঠার মূলে অবশ্যই তুর্কি বিজয়। যা বর্ণহিন্দুদের অপ্রতিহত সামাজিক অধিপত্যকে বিনষ্ট করে।

প্রাচীনকাল থেকে বাংলা সাহিত্যের একটা বিরাট অংশজুড়ে রয়েছে অন্ত্যজশ্রেণীর জীবন বৃত্তান্ত। স্বাভাবিকভাবেই কাল পরম্পরায় এই অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের প্রতি জীবন জিজ্ঞাসা অর্থাৎ তাদের জীবিকা, আচার-আচারণ, রীতিনীতি, ধর্মীয় সংস্কার-বিশ্বাস, কৃষ্টি-সংস্কৃতি, জীবনশৈলী ইত্যাদি নিয়ে সাহিত্যিকদের আকর্ষণের অন্ত নেই। তাই নাথসাহিত্য, মঙ্গলকাব্য, বিভিন্ন ধরনের লৌকিক আখ্যান বা লোকসাহিত্য, ছাড়াও পরবর্তী সময়েও বিভিন্ন সাহিত্যিকগণ নানাভাবে তাদের সাহিত্যে এই অন্ত্যজ শ্রেণীর জীবন-কাহিনী নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। অন্ত্যজ শ্রেণীর জীবন বৃত্তান্ত কথাসাহিত্যের মধ্য দিয়ে যত সহজে স্বাচ্ছন্দে প্রকাশ করা যায় অন্য কোন ধারায় এত সুস্পষ্টরূপে হৃদয়গ্রাহী করা সম্ভব হয়না বলেই মনে কর হয় । তার মানে এই নয় যে নাটক এবং কাব্যে তার প্রভাব একেবারেই নেই। আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার বহুল প্রয়োগ মূলত শহরকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে। সেখানে ছিল শহরের বাবুদের কথা, ধনী উচ্চবিত্ত মানুষের কথা। ধীরে ধীরে তাদের ব্যভিচারের দুর্নীতির কথা স্থান পেল বিভিন্ন সাহিত্য ধারায়। উঠে এলো গ্রামের প্রান্তজনের কথা। যারা ব্রাত্য পদদলিত।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যক্তিগত জীবনে জমিদার পরিবারের জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তা সত্ত্বেও বীরভূমের প্রান্তিক মানুষের সঙ্গে ছিল তার আন্তরিক যোগ যা তাঁর উপন্যাসগুলোতে লক্ষ্য করা গেছে। এ প্রসঙ্গে বলেছেন শ্রী ভূদেব চৌধুরী

> "বীরভূম জেলার ব্রাহ্মণ জমিদার চালিত গ্রামে ক্ষয়িষ্ণু জমিদার পরিবারে জন্মের গ্রাম-জোড়া, তথা পারিপার্শ্বগত, দরিদ্র-অশিক্ষিত আদিবাসী মানুষের জীবনের সঙ্গে খুজে পেয়েছিলেন অন্তরের যোগ। আরেকদিকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন জমিদারি অভিজাত্যের সামাজিক বুনিয়াদ ভেঙ্গে গিয়ে চারপাশে গড়ে উঠেছিল অর্থ গৃধ্ন আত্মসর্বস্ব ধনতান্ত্রিক জীবন ব্যবস্থা-সমাজ ভেঙ্গে যাওয়ার জন্ম।" [৬]

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যে এমন অনেক উপন্যাস-ছোটগল্প রয়েছে যেখানে নিম্নবর্গীয় জনজাতির জীবন জীবিকা, লোক বিশ্বাস-সংস্কৃতি, দৈনন্দিন জীবন যাপন প্রণালী, বিভিন্ন সংস্কারের দ্বন্দ্ব, আদিম জৈবিক প্রবৃত্তি প্রেম ভালোবাসা, দীন-দারিদ্র্যের চিত্রফুটে উঠেছে। অধ্যাপক ক্ষেত্রগুপ্তের ভাষায় "রাঢ়ের রুক্ষভুমির স্পর্শ, শ্রমজীবী চরিত্রের ভাস্কর্যনিপুন গঠন এবং সুতীব্র আত্মানুসন্ধান তাঁর উপন্যাসকে দুর্লভ শিল্পোৎকর্ষ দিয়েছে।" [৭] আলোচ্য প্রবন্ধটিতে সংক্ষিপ্ত পরিসরে তার কিছু উপন্যাস ও ছোট গল্প নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও এর বাইরে অনেক উপন্যাস ও ছোটগল্প রয়ে গেছে।

'পাষানপুরী' উপন্যাসটি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লব্ধ এক কর্মার বা কর্মকার জাতির অন্তর্গত কালি কর্মকারের জীবন কাহিনী। উপন্যাসে উল্লেখ রয়েছে বাগদী সম্প্রদায়ের কথা। জাতে কামার লোহা পেটানো হাত, গ্রামের লোক উচ্চশ্রেণীর পরোচনায় পড়ে তাকে একঘরে করে। বামুন রাখাল মজুমদার বাগদিণী বাসিনীকে পাবার আকাঙ্ক্ষায় কালি কর্মকারকে ঘরে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারতে চায়। কালি কর্মকার পরিকল্পনাটি জানতে পারায় সে বেঁচে যায়। এর প্রতিশোধ নিতে অনিচ্ছাকৃতভাবে অসাবধানবশত কালি কর্মকার রাখাল মজুমদারকে হত্যা করে বসে। বিচারে তার ফাঁসি হয়। উচ্চশ্রেণীর ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে এরকম অন্ত্যজ শ্রেণীর বহু পরিবার যে বিপর্যয়ের মুখে পতিত হতো তার নিদর্শন আলোচ্য উপন্যাসটি। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় কাহার, বাগদি, বাউরি, ডোম প্রভৃতি জাতের মানুষের জীবন কাহিনী নিয়ে একাধিক গল্প উপন্যাস লিখেছেন। সেখানে রয়েছে তাদের জীবনযাপন প্রণালী, সংস্কার সংস্কৃতি, বিভিন্ন লৌকিক বিশ্বাস, রয়েছে প্রাচীনের সঙ্গে নবীণের দ্বন্দ্ব, আবার রয়েছে তাদের সামাজিক উত্তরণের কাহিনী। বেদে সমাজে প্রচলিত ধর্ম, বিভিন্ন বিশ্বাস-সংস্কার, সনাতনীপ্রথা, লোকাচার, জীবনাচারণের কাহিনীর বাস্তব সম্মত ভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

পৌরাণিক মঙ্গলকাব্যের আখ্যান এবং বেদে সম্প্রদায়ের লৌকিক জীবন, লোকগাঁথা লোকসংস্কৃতি, তাদের উপকথা, মন্ত্রপাঠ, গান, কুসংস্কার, জীবিকা উপার্জনের মাধ্যম মাদুলি তাবিজ বিক্রি, পুরুষতান্ত্রিক সমাজের আধিপত্য এবং নাগিনী কন্যার বিষহরি প্রতি ধর্ম প্রতিপালনের এবং তার ক্ষমতার দ্বন্দ্ব এই দুইয়ের মাঝে উপন্যাসে ফুটে উঠেছে বেদের সমাজের একটি জীবনচিত্র 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' উপন্যাসটিতে সুন্দরভাবে ফুটেছে। শির বেদের শাসন ও বিষহরির সেবায় উৎসর্গীকৃত নাগিনী কন্যার ক্ষমতায়নের দ্বন্দ্বের কাহিনী নিয়ে রচিত হয়েছে উপন্যাসটি।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কবি' উপন্যাসটি অন্ত্যজ শ্রেণীর এক আলেখ্য নিদর্শন। ডোম সম্প্রদায়ভুক্ত নিতাইয়ের কবিয়াল হয়ে ওঠার এক অসাধারণ জীবন বৃত্তান্ত। ঠাকুর ঝি, বসন্ত দুটি নারীর সঙ্গে তার সম্পর্কের জট কাহিনীর কথাবস্তু। কাহিনীটিতে নিতাইয়ের সঙ্গে মুচিণী ঠাকুরঝির প্রণয় বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে। চরিত্র সৃষ্টির উজ্জল প্রতিভা, গানের সহজ সরল কথার সঙ্গে বেদনা মিশিয়ে সব মিলিয়ে এক অনবদ্য উপন্যাস এটি। নিতাইয়ের ডোম থেকে কবিয়াল হয়ে উঠার পিছনে রয়েছে তার কঠোর সংগ্রাম ও নানা ঘাত-প্রতিঘাত। তার এই উত্তরণ সহজে ঘটেনি। উপন্যাসটিতে শুধু ডোম সম্প্রদায়ভুক্ত নয় রয়েছে ঝুমুরদের কথা কুলি, মজুর, দোকানি, বিভিন্ন বৃত্তিধারী মানুষের উল্লেখ। তারাশঙ্কর ব্যক্তিজীবনে বাগদি, চামার, বাউরি, সাপুড়ে, কাহার প্রভৃতি ব্রাত্যজনের দৈনন্দিন জীবন কাহিনীর সঙ্গে ছিল তার প্রত্যক্ষযোগ তাই অতি সহজে কাহিনী বয়নে ব্রাত্যদের জীবন যাপন প্রণালী, জীবনচর্যা অতিবাস্তবসম্মত রূপদান করেছেন। 'কবি' উপন্যাসটিও ব্রাত্যজনের

জীবন কাহিনী নিয়ে রচিত সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কবি উপন্যাসের নায়ক ডোম সম্প্রদায়ভুক্ত নেতাইচরণ। ডোমেরা পূর্বে গৌরবময় বংশ মর্যাদার অধিকারী ছিল মুঘল আমলের পর ইংরেজ আমলে এসে তারা পূর্ব গৌরব হারিয়ে অপরাধপ্রবণ কাজের নিযুক্ত হয় তারপর নৃত্য গান করে জীবিকা নির্বাহ করে। এ ইতিহাসটির আভাস উপন্যাসটিতে নিতাই কবিয়ালের মধ্যদিয়ে উপন্যাসিক অতিবাস্তবসম্মত তুলে ধরেছেন।

'কালিন্দী' উপন্যাসটিও নিম্নবর্গের দ্বন্দ্ব বিক্ষোভের কাহিনী। কালিন্দীর বুকে জেগে ওঠা চরকে কেন্দ্র করে উপজাতি সাঁওতালদের সঙ্গে জমিদার, মহাজনদের দ্বন্দ্বের কাহিনী। যে জমিতে সাঁওতালরা ফসল ফলিয়েছে সেই জমি উচ্চ ধনীশ্রেণী এসে গ্রাস করেছে। সেই চর একদিন সাঁওতালদের ছাড়তে বাধ্য করা হয়েছে। উপন্যাসটিতে সামন্ততন্ত্রের অবসান এবং ধনতন্ত্রের শুরু হয়েছে। কৃষির পরিবর্তে শিল্পের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রামের মানুষ কৃষিকাজ ছেড়ে শহরে গিয়েছে কাজের জন্য নয়তো শহরের শিল্প এসেছে গ্রামে। ফলে বাংলার নিম্নবর্গীয়রা নিজেদের স্বনির্ভরতা হারিয়েছে। যা অনুরুদ্ধ কামার, গিরিশ ছুতোর, পাতু মুচি সহ অন্যান্য বৃত্তিধারী মানুষের স্বনির্ভরতা বা সকর্ম হারানোর চিত্রটির মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে। এছাড়াও সাঁওতালরা তারা তাদের ভূসত্ত্ব হারিয়ে চর থেকে অন্যত্র পাড়ি দিতে বাধ্য হয়েছে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রাঢ় অঞ্চলের বেদে, কাহার, সাপুড়ে, বাগদী, দুলে বাউরী প্রভৃতি অন্ত্যশ্রেণীর রূপচিত্র অংকনে তার জুড়ি মেলা ভার। তার 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' বাঁশবাদী গ্রামের কাহার সম্প্রদায়ের রূপচিত্র চিত্রিত হয়েছে। সেখানে বিভিন্ন অন্ত্যজশ্রেণীর লোকবিশ্বাস-সংস্কার, রীতিনীতি, প্রচলিত তাদের ধ্যান-ধারণা, প্রাচীন সনাতনীপ্রথা, প্রাচীন ও নবীনের দ্বন্দ্ব, বন্য জীবনের সঙ্গে আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার দ্বন্দ্ব, কঠোর জীবনসংগ্রাম, প্রভৃতির রূপ চিত্র অতি সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন ঔপন্যাসিক আলোচ্য উপন্যাসটিতে। বিশ শতকের প্রথম থেকেই গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের সমাজ জীবনে সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পটপরিবর্তন হতে শুরু করে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ঘাসের ফুল' গল্পটিতে রানিগঞ্জের কয়লা খনির শ্রমজীবী মানুষের দুঃখ দুর্দশার চিত্র বর্ণিত হয়েছে।সাঁওতাল কুলিকামিনদের জবনযন্ত্রনার এক আলেখ্য গল্পটি।

অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষ অশিক্ষিত। তাদের মধ্যে প্রকৃত জ্ঞানের বিকাশ ও সচেতনতার অভাব থাকায় তারা ধর্মীয় কোন বিষয়ে বা প্রাচীন সনাতনী প্রথা সম্পর্কে কৌতূহল প্রকাশ করে বিচার করতে চায় না। তারা নিজস্ব ভাবনাতে কৌম গোষ্ঠীতে বসবাসেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। বাগদি জাতির প্রসঙ্গ উল্লেখিত ছোটগল্প 'বাগদী পাড়া দিয়ে' গল্পটিতে বাগদি জাতির প্রচলিত ধর্ম বিশ্বাসকে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। এখানে বাগদি জাতির নিজস্ব ধর্মমত, সংস্কার-সংস্কৃতি, গুরুত্বসহকারে দেখান হয়েছে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'ডাক হরকরা' (১৩৪৩), 'জাদুকরী'(১৩৪৮) 'স্থলপদ্ম', 'চৌকিদার' এরকম বহু গল্পের এর নামকরা যেতে পারে। 'ডাক হরকরা' গল্পটি দিনু ডোমের সততার কাহিনি বিধৃত। সে একজন পেশায় ডাক হরকরা। পিতৃ সত্তা থেকে তার কাছে কর্মের প্রতি সততা বড় হয়ে দেখা দিয়েছ। পুত্রেরর দুষ্কর্মে সাজা দিয়ে অবশেষে পুত্রের মৃত্যুতে মর্মাহত হয়েছেন। ট্রাজেডির মধ্যে দিয়ে গল্পটির পরিসমাপ্তি ঘটেছে। 'রসকলি' গল্পটিতে বোষ্টমী ধোপা মঞ্জুরীর জীবন কাহিনীর প্রেমে ব্যর্থতা হতাশা করুনার এক মর্মন্তুদ কাহিনী। 'নারী ও নাগিনী' গল্পের বিষয় বেদে বেদিনীর প্রেম ভালোবাসা দাম্পত্যময় ট্রাজেডি জীবনে এক উদয়নাগ নামক সর্পিনীকে কেন্দ্র করে জীবন বিষাক্ত হবার কাহিনী। বেদে খোঁড়া শেখের স্ত্রী যোবেদারের সতীন হিসাবে তাদের দাম্পত্য জীবনের এক সর্পিনীর। সেই সর্পিনীও যেন স্বামি খুঁড়াশেখের প্রতি এতটুকু ভালোবাসা ছাড়তে নারাজ। তাই যোবেদাকে দংশন করে। কিন্তু সর্পিনী বিবির প্রতি ভালোবাসা ফলে খুঁড়া শেখ না মেড়ে তাকে তাড়িয়ে দেয়। এই রকমই একটি বেদে জীবনের দাম্পত্য কাহিনী নিয়ে রচিত হয়েছে 'নারী ও নাগিনী' গল্পটি। 'চৌকিদার' গল্পটিও এক বাগদি পরিবারের দুঃখ-দুর্দশার বিপর্যয় বিষন্নতার কাহিনী।

সাঁওতালদের লোকসংস্কার লোকসংস্কৃতি ও কুসংস্কার নিয়ে গড়ে উঠেছে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ডাইনি' নামক আখ্যানটি। ডাইনি নামক কুপ্রথাটি সাঁওতাল, বাগদি, দুলে এর মত অন্ত্যজশ্রেণীর মানুষের মধ্যে প্রচলিত একটি কুসংস্কার। গ্রামে কোন রোগ-ব্যাধি উপদ্রব হলে বা গ্রামের কারো কোনো রকম ক্ষতি হলে জনগণ সন্দেহভাজন অসহায় কোন নারীকে ডাইনি অপবাদ দেয়। ডাইনি অপবাদে চিহ্নিত কে গ্রামছাড়া করা এবং তাকে পুড়িয়ে মারার মতো ভয়ংকর সব ঘটনা ঘটিয়ে থাকে গ্রামস্থ অশিক্ষিত সমাজের মানুষেরা।

'তারণী মাঝি' গল্পটিতে তারিনী চরিত্রটির মধ্য দিয়ে আদিম জৈব-জীবন তৃষ্ণার কাছে মানবিক প্রেম যে তুচ্ছ তার এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত গল্পকার তুলে ধরেছেন। তারিণী মাঝি জলে ডুবে যাওয়া মানুষকে ত্রাণ বা প্রাণ বাঁচান। কিন্তু যখন তার নিজের প্রাণ বাঁচানোর প্রশ্ন চলে আসে তখন সে ডুবন্ত স্ত্রীকে জলে ডুবিয়ে দিয়েছেন। অথচ এই স্ত্রীর প্রতি ছিল তার অপরিসীম ভালোবাসা। তারিনী শ্রমজীবী নিম্নবর্গীয় মানুষ অথচ স্ত্রীর প্রতি ছিল অকৃত্রিম প্রেম। ময়ূরাক্ষী নদীতে খেয়াপাড়া পাড়া করেই তার জীবন জীবিকা নির্বাহ হয়ে থাকে। স্ত্রী সুখী ছাড়াও ময়ূরাক্ষী নদী তার জীবন জীবিকাকে প্রভাবিত করেছে। গল্পটিতে সমাজের বিভিন্ন সংস্কার, বিভিন্ন রীতিনীতি দিকটিও ফুটেছে। তাদের বিশ্বাস পুন্যদিনে গঙ্গাস্নান করলে পুণ্যার্জন হয়। সমাজের মানুষ নানা অনুষ্ঠান, যাগ-যজ্ঞ, পূজার্চনায় বিশ্বাসী কর। তাই তারিনীও 'বানের লেগে পুজো দেয়।' এই উপলক্ষে পাঠা বলিও দেয়। লোকসমাজের বিশ্বাস পিঁপড়ের মুখে ডিম নিয়ে চলাচল বন্যার প্রাদুর্ভাব ঘটে। তাই তারিনী যখন গ্রাম ত্যাগ করে চলে যাচ্ছিল তখন পিঁপড়ের মুখে ডিম দেখে সে আবার গ্রামে ফিরে এসেছে। 'পিঁপড়েতে ডিম মুখে নিয়ে ওপরের পানে চলল।'

নিম্নবর্গীয় জনগোষ্ঠীর আদিম জৈব-প্রবৃত্তির লালসার এক প্রেমের গল্প 'বেদেনী।' গল্পটিতে রয়েছে এক নারী দুই পুরুষের প্রতি আসক্ত হওয়ার কাহিনী। রাধিকা বেদেনীর প্রথম প্রেমিক পুরুষ ছিল শিবপদ। জাতে বেদে থাকলেও সে সাপ নিয়ে খেলা দেখাতো না, সে বেতের জিনিসপত্র বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতো। শিবপদ এবং রাধিকা বেদের দুজনে দাম্পত্য জীবন সুখেই ছিল। কিন্তু শম্ভুক বাজিকরের আকর্ষণে শিবপদকে ছেড়ে শম্ভুকবাজি করের তাঁবুতে প্রবেশ করে। এবং মেলায় মেলায় সার্কাস দেখিয়ে দিন কাটায়। বেদে হলেও তারা নামাজ পড়ে, পূজা পাঠ করে, হিন্দু ধর্ম নিয়মকানুন মেনে চলে। অদ্ভুত সংস্কৃতির মেলবন্ধন এ জাতির মধ্যে রয়েছে। একদিন এক মেলায় শুম্ভুক-রাধিকা সার্কাস ওয়ালাদের সঙ্গে কিষ্ট বেদের সার্কাস আসে। ভাইয়ের মধ্যে বিবাদ চরমে পৌঁছায়। মানুষ কিষ্টর সার্কাসে ভিড় জমায় কারণ শুম্ভুক বাজিকরের সার্কাস থেকে তার সার্কাসের ছিল জাঁকজমকপূর্ণ। রাধিকা বেদিনী প্রতিহিংসার জ্বালায় জ্বলে ওঠে। কিন্তু এই প্রতিহিংসার জ্বালাই একসময় তার কাছে ভালোবাসার রূপ নেয়। গল্পটিতে নীতি-আদর্শ কাছে যে জৈব-প্রবৃত্তির প্রেমে লালসার প্রাধান্য পেয়েছে তব এই 'বেদিনী' গল্পটিতে লক্ষ্য করা গেছে।

তারাশঙ্করের গল্প কাহিনীতে বাগদি, বাউরী, ডোম, এরকম বহু নিম্নবর্গের কথা উঠে এসেছে। এইসব জনজাতি অনেক সময় অসামাজিক ডাকাতি নর হত্যার মতো কুকর্মে লিপ্ত হয়ে থাকে। তাশংকরের লেখায় "বেদের টোল, আখড়া ও আখড়াইয়ের দীঘি, বাদশাহী সড়কের পাশে শিকার-সন্ধানে প্রতীক্ষারত ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মতো ঠ্যাঙ্গারাদের কথা, ভাষায় ক্লাসিক সংহতি ও গভীর অন্তরদৃষ্টিতে প্রকাশ পেয়েছে।" [৮]

এরকম একটি গল্প 'আখড়াইয়ের দীঘি' যেখানে খুনি, ডাকাত কালীচরণ ওরফে কালি বাগদির চরিত্র কার্যকলাপের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। সর্বস্ব লুট করার বাসনা নিয়ে বাগদী কালীচরণ একদিন ভুল করে সন্তানকে খুন করে ফেলে। কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে হয়, প্রকৃতির এই শিক্ষা দ্বারাই তার দ্বীপান্তরে যাবজ্জীবন জেল হয়। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যে এমন অনেক উপন্যাস-ছোটগল্প রয়েছে যেখানে নিম্নবর্গীয় জনজাতির জীবন জীবিকা, লোক বিশ্বাস-সংস্কৃতি, দৈনন্দিন জীবন যাপন প্রণালী, বিভিন্ন সংস্কারের দ্বন্দ্ব, আদিম জৈবিক প্রবৃত্তি প্রেম ভালোবাসা, দীন-দারিদ্র্যের চিত্রফুটে উঠেছে। আলোচ্য প্রবন্ধটিতে সংক্ষিপ্ত

পরিসরে তার কিছু উপন্যাস ও ছোট গল্প নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে । তা সত্ত্বেও এর বাইরে অনেক উপন্যাস ও ছোটগল্প রয়ে গেছে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

১. মজুমদার অতীন্দ্র (অধ্যাপক মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়, আষ্ট্রেলিয়া) চর্যাপদ। নয়া প্রকাশ কলিকাতা ৬। প্রথম প্রকাশ চৈত্র ১৩৬৭। প্রকাশক বারীন্দ্র মিত্র, পৃ: ১৩০।

২. তদেব, পৃ: ১৫৪।

৩. তদেব, পৃ: ১৬১।

৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. অসিতকুমার। বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত। প্রকাশক মডার্ন বুক এজেন্সি। প্রথম প্রকাশ ১৯৬৬ পুন:মুদ্র ২০০৩ ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ।

৫. চৌধুরী, শ্রী ভূদেব। বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। প্রকাশক বর্ণপরিচয় ও পুথিঘর। পৃষ্ঠা ৩১৪।

৬. ক্ষেত্রগুপ্ত। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস। প্রকাশক-শ্রী প্রেমময় মজুমদার। গ্রন্থ নিলয় প্রকাশন। প্রথম প্রকাশ ১৭ই আশ্বিন ১৩৫৮। পৃষ্ঠা ২১৩ ।

৭. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ। বাংলা গল্প বিচিত্রা। প্রথম প্রকাশ কলকাতা। ১৩৬৪ পৃষ্ঠা ৭১।

৮. মুদি, দীপক ও রায়, আশিস। সাহিত্যে অন্ত্যজশ্রেণি। প্রকাশক এবং প্রান্তিক, কলকাতা ৭০০১০২। প্রথম প্রকাশ ৯ই মে ২০১৮ ।